প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর : কী পেল বাংলাদেশ?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুল আলোচিত ৭ থেকে ১০ এপ্রিল চার দিনের ভারত সফর শেষ হলো। ভারতে যাওয়ার আগে উচ্ছ্বাস এবং ফিরে আসার পর সাফল্যের বিবরণ প্রচার মাধ্যমের সুবাদে জনগণ দেখেছেন এবং শুনেছেন। বন্ধুত্বের সফরে মর্যাদা নিয়ে ফিরেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন। কিন্তু যাওয়ার আগে দেশের জনগণ যেমন জানতে পারেনি কী বিষয়ে আলোচনা হবে; ফিরে আসার পরও দেশের জন্য কী লাভ হবে তাও জনগণ বুঝতে পারছে না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কতটা সম্মান-মর্যাদা, গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাই এখন আলোচনার প্রধান বিষয়। আর আমাদের জনগণকে এবং তাদের দাবি ও প্রত্যাশাকে কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? সেটা আলোচনায় স্থান পাচ্ছেনা! পানি চেয়েছি বিদ্যুৎ পেয়েছি, কিছুতো পেয়েছি এই কথা প্রধানমন্ত্রী হিন্দিতে বলায় তা এখন মুখরোচক কথা হিসেবে প্রচার হচ্ছে। 'কুছ তো মিল গেয়্যা' এটা শুধু কথা নয় এটা একটা মনোভাব। পানি আমাদের অধিকার আর বিদ্যুৎ তো আমরা ক্রেতা হিসেবে কিনবো। একটা আর একটার পরিপূরক নয়। ভারতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আলোচনা হবে বলে দেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল তা সংক্ষেপে বললে নিম্নরূপ :

ক. তিস্তাসহ আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন

খ. ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যঘাটতি নিরসন

গ. সীমান্ত হত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ

ঘ. ট্রানজিটের জন্য সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় দাবি এবং মাশুল বৃদ্ধি করা

ঙ. শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করা; বন্ধু রাষ্ট্রের সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া কেন? ইত্যাদি।

কিন্তু এসব তেমন আলোচনায় আসেনি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এবার ভারত সফরে দুই দফায় ৩৫ সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বক্ষরিত হয়। সই হওয়া চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকগুলো হলো-

১. 'বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ফ্রেমওয়ার্ক' সমঝোতা স্মারক।

২. কৌশলগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা খাতে সহযোগিতা বাড়াতে ঢাকার মিরপুরের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের সঙ্গে তামিলনাড়ুর ওয়েলিংটনের (নিলগিরিস) ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

৩. জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কৌশলগত শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে ঢাকার ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সঙ্গে নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সমঝোতা স্মারক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে চুক্তি সইয়ের পর তা বিনিময় করেছেন দুই কর্মকর্তা

৪. মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে সহযোগিতা বিষয়ে দু'দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

৫. পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে সহযোগিতা বিষয়ে দু'দেশের সরকারের মধ্যে চুক্তি।

৬. পরমাণু নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণে কারিগরি তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার লক্ষে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ) ও ভারতের আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (এইআরবি) মধ্যে চুক্তি।

৭. বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে সহযোগিতা বিষয়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আণবিক শক্তি কমিশনের (বিএইসি) সঙ্গে ভারতের আণবিক শক্তি বিভাগের গ্লোবাল সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার এনার্জি পার্টনারশিপের (জিসিএনইপি) সঙ্গে আন্তঃসংস্থা চুক্তি।

৮. তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স খাতে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ভারতের ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

৯. সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিমের সঙ্গে ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের সমঝোতা স্মারক।

১০. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত হাট স্থাপনে দু'দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১১. বিচারিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় দুই সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১২. ভারতে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও ভারতের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১৩. নেভিগেশনে সহায়তার ওপর সহযোগিতা বিষয়ে বাংলাদেশের নৌ-পরিবহন বিভাগ ও ভারতের লাইটহাউজ অ্যান্ড লাইটশিপস মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএলএল) মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১৪. ভূবিদ্যায় গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে পারস্পরিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (জেএসবি) সঙ্গে ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (জিএসআই) সমঝোতা স্মারক।

১৫. কোস্টাল ও প্রটোকল রুটে পেসেঞ্জার ও ক্রুজ সার্ভিসেসের ওপর দুই দেশের সমঝোতা স্মারক ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (এসওপি)।

১৬. বাংলাদেশ-ভারত প্রটোকল রুটে সিরাজগঞ্জ থেকে দইখাওয়া (লালমনিরহাট) ও আশুগঞ্জ থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত নাব্য চ্যানেলের (ফেয়ারওয়ে) উন্নয়নে দু'দেশের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১৭. গণমাধ্যম ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১৮. অডিও-ভিজুয়াল কো-প্রোডাকশনের ওপর দু'দেশের সরকারের মধ্যে চুক্তি।

১৯. প্রতিরক্ষা খাতে ৫০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা (এলওসি) বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সমঝোতা স্মারক।

২০. মোটরযান যাত্রী চলাচল (খুলনা-কলকাতা রুট) নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি এবং এসওপি।

২১. ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে তৃতীয় ঋণ সহায়তা দিতে (৪.৫ বিলিয়ন ডলার) দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

২২. বাংলাদেশে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণে অর্থায়নের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি। এর পর সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি কোম্পানির মধ্যে আরও ১৩টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

স্বাক্ষরিত চুক্তি ও এমওইউগুলো হলো : ১. বাংলাদেশের রামপালে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কম্পানি লিমিটেড এবং এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মধ্যে ফ্যাসিলিটি চুক্তি; ২. মেঘনা ঘাটে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎপ্রকল্প থেকে প্রথম পর্যায়ে ৭১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ে ভারতের রিলায়েন্স পাওয়ার এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বাস্তবায়ন ও ক্রয় চুক্তি; ৩. ত্রিপুরা থেকে আরও ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ভারতের এনটিপিসি বিদ্যুৎ ভেপার নিগম লিমিটেড এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সম্পূরক চুক্তি; ৪. নেপাল থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ভারতের এনটিপিসির সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক; ৫. ঝাড়খণ্ডে এক হাজার ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে আদানি পাওয়ার (ঝাড়খণ্ড) লিমিটেড এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে ক্রয় চুক্তি; ৬. ভারতের পেট্রোনেট এলএনজি লিমিটেড এবং বাংলাদেশের পেট্রোবাংলার মধ্যে 'হেডস অব আন্ডারস্যান্ডিং'; ৭. কুতুবদিয়া দ্বীপে ৫০০ এমএমএসসিএফডি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে রিলায়েন্স পাওয়ার ও পেট্রোবাংলার মধ্যে এমওইউ; ৮. এলএনজি সহযোগিতার লক্ষ্যে ইন্ডিয়া অয়েল করপোরেশন লিমিটেড এবং বাংলাদেশের পেট্রোবাংলার মধ্যে এমওইউ; ৯. ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড থেকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) কাছে ডিজেল বিক্রি ও ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি; ১০. কনটেইনার পরিবহনে কনটেইনার কম্পানি অব বাংলাদেশ এবং কনটেইনার করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার মধ্যে এমওইউ; ১১. চেন্নাইয়ের তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি সায়েন্স ইউনিভার্সিটি এবং চট্টগ্রামের ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক; ১২. ভারতের বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশের খুলনায় অবস্থিত নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির মধ্যে এমওইউ এবং ১৩. ভারতের টাটা মেডিক্যাল সেন্টার ও বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব মেডিক্যাল সার্ভিসেসের মধ্যে এমওইউ।

এবার প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পূর্বে সবচেয়ে বহুল আলোচিত বিষয় ছিল, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে কী হবে? বিশেষ করে তিস্তার পানি এবং মমতার ভূমিকা ছিল আগ্রহের কেন্দ্রে। তিস্তার পানি তো আলোচনার এজেন্ডাতে ছিলই না বরং মমতা নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে একটি 'নতুন ফর্মুলা' দিলেন। তিনি তোর্সা, ধানসিঁড়ি, মানসিঁড়ি ও জলঢাকাসহ চারটি নদীর নাম বললেন, যেখান থেকে পানি নিয়ে বাংলাদেশের চাহিদা পূরণ করা যায়। বাংলাদেশে তোর্সা ও জলঢাকা দুধকুমার ও ধরলা নামে পরিচিত। মমতার এই বক্তব্য কিন্তু ভারতের আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্পেরই নামান্তর। এর আগে ঢাকায় এসে মমতা অভিযোগ করেছিলেন, বাংলাদেশ আত্রাই নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। মমতার কাছে ধাক্কা খেয়ে প্রধানমন্ত্রী ভরসা করতে চাইলেন মোদী'র উপর। কিন্তু নয়াদিল্লিতে মোদি বললেন, মমতার সম্মতি নিয়েই তিস্তা চুক্তি হবে। মমতার বক্তব্যের পর মোদির আশ্বাস শুধু আশ্বাসের মধ্যে থেকে যায় কি না, সে আশঙ্কা থাকলই। কারণ ২০১৫ সালের জুন মাসে নরেন্দ্র মোদি ঢাকা এসে একই আশ্বাস দিয়েছিলেন, মমতাও তার ওপর ভরসা করতে বলেছিলেন; ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি! সীমান্ত হত্যা বন্ধের ব্যাপারে যৌথ ঘোষণাপত্রে কোনো উল্লেখ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেস ব্রিফিংয়ে পাটজাত পণ্যের ওপর ১৩ শতাংশ হারে ভারত যে অ্যান্টি ডাম্পিং শুল্ক ও ৩০ শতাংশ হারে তৈরি পোশাকের ওপর কাউন্টার ভেইলিং শুল্ক আরোপ করেছে, তা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে ভারতের তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ভারত যে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণের প্রস্তাব করেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ২০১০ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী, বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী ভারতের পক্ষ থেকে যে এক বিলিয়ন ডলার বা ১০০ কোটি টাকা ঋণের প্রস্তাব করেছিল, তার প্রায় ৫০ শতাংশ এখনো অব্যবহৃত রয়ে গেছে। ২০১৬ সালে আরো দুই বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রস্তাব দিয়েছিল ভারত। ওই অর্থের ছাড় এখনো শুরুই হয়নি। এখন এলো প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব। এতে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কথা, কিংবা কবে নাগাদ তা ছাড় দেওয়া হবে, তাতে রয়ে গেছে অস্পষ্টতা। উপরন্তু এসব ঋণ প্রকল্পে প্রকারান্তরে লাভবান হবে ভারতই। কারণ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ঋণের টাকার ৭৫% দিয়ে ভারতীয় পণ্য কিনতে হবে। বাকি ২৫%ও প্রকারান্তরে ভারতের পণ্যই কিনতে হবে। প্রতিরক্ষা খাতে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব আছে। বলা হচ্ছে বাংলাদেশ নাকি তার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই অর্থ দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম কিনতে পারবে। বাংলাদেশ কি এই টাকায় চীন বা রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে পারবে? প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে, তা এখন একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে গেল। অনেক আগে থেকেই সেনাসদস্যরা এসব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ তথা শিক্ষালাভ করেন। পরমাণু শক্তি কেন্দ্র নির্মাণে ও প্রশিক্ষণে যে সহযোগিতা কিংবা সাইবার নিরাপত্তা চুক্তি, বিচারপতিদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। খুলনা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিস, কিংবা ঢাকা-খুলনা-কলকাতা

বাস সার্ভিসের কথা বলা হয়েছে । প্রতিবছর প্রায় ১৩ লাখ মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে যায় । বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে ভারত বাংলাদেশের পর্যটক, চিকিৎসা-শিক্ষার জন্য যাওয়া মানুষদের কাছ থেকে। তাই ভিসা সহজীকরণের ক্ষেত্রে যদি কোনো ঘোষণা আসত, তা বাংলাদেশিদের জন্য ভাল হতে পারতো। কিংবা অস্ত্র কেনার জন্য ঋণ না করে বরং শিক্ষা-চিকিৎসার মান বাড়ানো জন্য ঋণ করলে তার একটা ইতিবাচক ফল হতে পারতো। ভারত থেকে ৫৫০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করার বিপরীতে বাংলাদেশের রপ্তানি ৬৫ কোটি ডলারের কম। এই বিপুল বাণিজ্য বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যাপারেও কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। বরং ব্যবসায়ীদের বিশাল বহর নিয়ে ভারতে যাওয়ার মাধ্যমে ভারতের ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসা বাড়ানোর নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে এই সফর।

বন্ধু রাষ্ট্র বলে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব পৃথিবীর কোন দেশের সাথেই থাকতে পারে না। ভারত বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী এবং একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। ভারতের অর্থনীতির আয়তন ২.২৫ লক্ষ কোটি ডলার। রিজার্ভের পরিমাণ ৩৫৯ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবছর আমদানি করে ৪০২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। বাংলাদেশের তুলনায় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে সে তার বাণিজ্য সুবিধা, তার দেশের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে করিডোর কানেকটিভিটির সুবিধা নিতে চায়, সামরিক কর্তৃত্ব, ভূরাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভারত তার বিপুল উদ্বৃত্তের কিছু অংশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। সম্প্রতি চীনের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর, ২২ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা প্রস্তাব, চীনের কাছ থেকে অস্ত্র সাবমেরিন ক্রয়, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ইত্যাদি ভারতকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে মার্কিন–ভারত-চীন এক দখল প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। বাংলাদেশের সস্তা শ্রমশক্তি, ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ, সমুদ্রের সম্পদ, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে ভারতের দুই অংশের মধ্যে সহজ সংযোগের সম্ভাবনা, একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের কারণে ভোগ্যপণ্যের বাজার আজ লুণ্ঠনকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণিও জনগণের স্বার্থ দেখার চাইতে দেশি-বিদেশি লুটপাটকারীদের স্বার্থ রক্ষায় উদ্‌গ্রীব। ভারতের সাথে চুক্তি ও সমঝোতা তাই দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ভারত নৌ-সড়ক-রেল করিডোর তো পেয়েছে, বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে এখন বিদ্যুৎ করিডোর করে আসাম থেকে বিহারে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার সুবিধাও পাবে। ভারত থেকে ফিরে সংবাদ সম্মেলন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি সেখানে কোন কিছু চাইতে যাইনি। গিয়েছিলাম বন্ধুত্ব চাইতে সেটা পেয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী বন্ধুত্ব পেয়েছেন আর ভারত পেয়েছে ব্যবসা। দুপক্ষই পরিতৃপ্ত এবং খুশি। কিন্তু দেশের জনগণ পানির অধিকার, বাণিজ্য ঘাটতি কমানো আর সীমান্ত হত্যা বন্ধসহ দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা অমীমাংসিত বিষয়ের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা পেল না। এক তরফা বন্ধুত্বের এই নিদর্শন দেখে দেশের মানুষ হতাশ। সংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠতে পারে যে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বকালের রেকর্ড ছুঁয়েছে যা এখন প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার সে দেশ কেন ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তার জন্য এত উদ্‌গ্রীব? যে ঋণের ৭৫ শতাংশ ব্যবহার করতে হবে ঋণদাতা দেশের কাছ থেকে পণ্য সামগ্রী কিনে সেই ঋণ কি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে? ভারতের দরিদ্র জনগণের জন্য অর্থ বরাদ্দে ভারত রাষ্ট্রের উদ্যোগের চাইতে বাংলাদেশ ঋণ দিতে তাদের এই উৎসাহের কারণ কী?

আসলে দুই দেশের শাসক শ্রেণিই জনগণকে বঞ্চিত করে এবং অন্ধকারে রেখে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। বাংলাদেশের জনগণকে তাই বলতে হবে ঋণ চাইনা, লুণ্ঠন আগ্রাসন বন্ধ কর।

বাস্তবে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি ও ভারতের শাসকশ্রেণির চরিত্র একই; জনগণের অধিকার বঞ্চিত করা, শোষণ করা। তাই দুই দেশের শাসকদের বন্ধুত্ব নয় দরকার দুই দেশের জনগণের বন্ধুত্ব এবং সমমর্যাদা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে দুই দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন বেগবান করা।